Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-X, Issue-IV, July 2022, Page No. 94-101
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

রাজধর্ম ও নৈতিকতা : প্রেক্ষাপট মহাভারত ও বৌদ্ধশাস্ত্র

Dr. Debabrata Saha
Associate Professor of Philosophy, Kazi Nazrul University, Asansol, West-Bengal

Abstract:

Rajdharma as a concept constitutes the judicious duties of king towards his subjects. The basic concern of the rajdharma is welfare of the people. The king and kingship is associated with the concept and concern of the prajapalanah. Rajdharma is a reflection of morality and Justice which is the foundation of a good social system. This short discourse will try to focus Rajdharma as the welfare founded by justice and morality. The ancient Indian classic Mahabharata and the Bouddha school of Indian Philosophy have dealt a lot regarding the Rajdharma to establish a principle by which peaceful and prosperous life can be formed. In this research article I have tried to highlight the basic nature of Rajdharma in the light of Mahabharata and Bouddha school of Indian Philosophy.

সমাজের অস্তিত্বের জন্যই রাষ্ট্রের প্রয়োজন। রাষ্ট্র না থাকলে সমাজব্যবস্থা বলে কিছু থাকে না। রাষ্ট্র থাকলেই রাজার অস্তিত্ব অনিবার্য, কারণ, নৈরাজ্য থেকে মুক্তির জন্যই রাজার প্রয়োজন। রাজার অস্তিত্ব থাকলে রাজনীতি থাকতে বাধ্য আর রাজনীতির ভিত্তি হল নৈতিকতা। তাই এই নিবন্ধের বিষয় হল রাজধর্ম ও নৈতিকতা। ধর্মের সঙ্গে নীতি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। ধর্ম যদি মালা হয় তো নীতি সেই মালার প্রতিটি পুষ্প। তাই রাজধর্ম আসলে নৈতিকতারই প্রতিফলন। এই রাজধর্ম ও নৈতিকতার বীজ অঙ্কুর রূপে ফুটে উঠেছে মহাভারতের মাটিতে। তাই মহাভারতের অঙ্গিকে এই আলোচনা না করলে আলোচনা অপূর্ণ থেকে যাবে এবং সেই সঙ্গে বৌদ্ধশাস্ত্রে রাজতন্ত্রে কিভাবে নৈতিকতার চরম মাত্রা প্রতিফলিত হয়েছে সেটাও এই নিবন্ধের অন্তরালে স্থান পাবে। তাই এই নিবন্ধের বিষয়বস্তু হল মহাভারত ও বৌদ্ধশাস্ত্রের আলোকে রাজধর্ম ও নৈতিকতা।

মহাভারতের যুগের রাজনীতি বর্তমান সমাজব্যবস্থায় সমান তালে চলছে। তবে রাজার অস্তিত্ব না থাকলেও রাজনীতির অভাব নেই। এখানে রাজনীতির জন্য রাজার প্রয়োজন নেই, তবে রাজা শব্দের প্রয়োজন অবশ্যই আছে। সেকারণেই হয়তো এযুগে ধ্বনিত হয় আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে। তাই এই রাজা শব্দের উৎপত্তি কিভাবে হল তা আলোচনা করবো মহাভারত ও বৌদ্ধশাস্ত্রের আঙ্গিকে। তারপর আলোচনা করবো রাজার দোষ, কর্তব্য, প্রজাবিদ্রহ, কূটনীতি এবং নৈতিকতা কিভাবে রাজধর্মের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

মহাভারতকে সংহিতা অর্থাৎ সংগ্রহ গ্রন্থ এবং পঞ্চম বেদস্বরূপ ধর্মগ্রন্থও বলা হয়। মহাভারত অতি প্রাচীন সমাজ ও নীতি বিষয়ক তথ্যের অনন্ত ভাণ্ডার। এই মহাভারতকে রাজনীতি পর্বের একটি আকর গ্রন্থ বললে হয়তো অত্যুক্তি হবে না।

আবার বৌদ্ধশাস্ত্রেও রাজনীতি বিষয়ে যে সচেতনতা লক্ষ্য করা যায় তা আমাদের বিস্মিত করে। গৌতম বুদ্ধের সমসাময়িক কালে রাজতন্ত্রেরই প্রচলন ছিল, যেখানে রাজাই সর্বেসর্বারূপে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। তিনি ছিলেন আসনের রক্ষক ও প্রতিপালক।

বৌদ্ধশাস্ত্রে রাজা শব্দের উৎপত্তি:

বিশুদ্ধিমার্গ এবং দীঘনিকায়-এ[1] উল্লেখ আছে যে, সৃষ্টির আদিতে রাজা বলে কোন প্রশাসক ছিল না। সেই সময়কার মানুষের মন ছিল শুদ্ধ-পবিত্র, তাদের জীবন যাত্রা ছিল সহজ-সরল ও অনাড়ম্বর। তাদের মধ্যে বাদ-বিবাদ ও পরস্পর ভেদাভেদ ছিল না। কিন্তু কালের অমোঘ নিয়মে বিবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এবং দৈহিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে চারিত্রিক ও মানসিক বিকাশ ক্রমশঃ নিম্নগামী হতে শুরু করলো। বসবাসের উপযোগী বাড়ী এবং জমির নির্দিষ্টিকরণ শুরু হল, ফলে লোভ ও মোহের জন্ম হল। এই লোভ ও মোহের বশবর্তী হয়ে বাদ-বিবাদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। দেখা দিল নানান বিশৃঙ্খলা। এর ফলে চৌর্যবৃত্তি, মিথ্যাচার, পরনিন্দা ও হিংসা এই চারপ্রকার কু-প্রবৃত্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো। এই উৎশৃঙ্খল অবস্থা দেখে প্রত্যেকেই ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পরিত্রাণের পথ খুঁজতে শুরু করলো। ত্রাতা হিসাবে এমন একজনকে নির্বাচিত করতে চেয়েছিল যে কিনা সুন্দর-সুদর্শন দেখতে হবে এবং যে সুদক্ষ, নিরপেক্ষ ও জনদরদী প্রশাসকরূপে সকলের হৃদয় জয় করবে। তাঁরা সেই আদর্শবান পুরুষের নাম দিয়েছিলেন রাজা। এই রাজার কাজ ছিল নৈরাজ্যমূলক অবস্থাকে প্রতিহত করা। যে চার প্রকার কু-প্রবৃত্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল তাকে অর্থাৎ অরাজকতাকে প্রতিহত করার জন্য রাজা নির্বাচিত হয়েছিল।

মহাভারতে রাজা শব্দের উৎপত্তি:

শান্তিপর্বের ৫৯ নং অধ্যায়ে[2] একটি আখ্যানের মধ্য দিয়ে রাজার উদ্ভবের কাহিনী আলোচনা করা হয়েছে। ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলছেন, প্রথমে পৃথিবীতে রাজা, রাজ্য, দণ্ড বা দণ্ডার্হ ব্যক্তি কিছুই ছিল না, ফলে তারা মোহ, লোভ এবং হিংসার বশবর্তী হয়ে কর্ম করত। সেই অবস্থায় দেবতারা চিন্তিত হয়ে ব্রহ্মার কাছে গেলেন এবং পৃথিবীবাসীর সমস্ত কথা খুলে বললেন, ব্রহ্মা সমস্ত কিছু শুনে একটি নীতিশাস্ত্রের প্রণয়ন করলেন, এই নীতশাস্ত্রের নামই দণ্ডনীতিশাস্ত্র। তারপর এই নীতিশাস্ত্রের প্রয়োগ কর্তা হিসাবে রাজাকে মনোনীত করলেন। জগতে দণ্ড বিধানের জন্য প্রয়োজন কতগুলি নীতির— যা দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করবে। প্রথমে এই নীতিশাস্ত্রের অধ্যায় সংখ্যা ছিল একলক্ষ। দেবাদিদেব মহাদেব প্রথম এই দণ্ডনীতিশাস্ত্র ব্রহ্মার কাছ থেকে গ্রহণ করেন এবং মানুষের আয়ু কম বলে ব্রহ্মা রচিত এই দণ্ডনীতিশাস্ত্র দশ হাজার অধ্যায়ে সংক্ষিপ্ত করেন। এরপর ভগবান ইন্দ্র যথাক্রমে পাঁচ হাজার অধ্যায়ে, বৃহস্পতি তিন হাজার অধ্যায়ে এবং শুক্রাচার্য এক হাজার অধ্যায়ে সংক্ষিপ্ত করেন। এই দণ্ডনীতিশাস্ত্রের মূল আলোচ্য বিষয়গুলি হল, ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এবং মোক্ষের সত্ত্ব, রজঃ ও তম নামে তিনবর্গ, বৃদ্ধি, ক্ষয় ও সমানত্ব নামে দণ্ডজ ত্রিবর্গ, জ্ঞানকাণ্ড, কর্মকাণ্ড, কৃষি বাণিজ্যাদি জীবিকাকাণ্ড, দণ্ডনীতি, অমাত্য রক্ষার্থ নিযুক্তচর ও গুপ্তচর নিয়োগের বিষয়, সাম, দান, ভেদ, দণ্ড, ভেদকারণ মন্ত্রণা ও বিভ্রম, অধম, মধ্যম ও উত্তম এই তিন প্রকার সন্ধি, ধর্মযুক্ত বিজয়, অর্থ দ্বারা বিজয়, আসুরিক বিজয়, বিচিত্র যুদ্ধ কৌশল, সপ্তাঙ্গ রাজ্যের হ্রাস-বৃদ্ধি ও সমতা, দেশ, জাতি ও কুলের ধর্ম, পৌরজনের রক্ষাবিধান ইত্যাদি ইত্যাদি অলোচিত হয়েছে। দণ্ডনীতিশাস্ত্র অনুসারে রাজধর্ম পালনই রাজার অন্যতম কর্তব্য। রাজার ক্ষমতাকে অধিকার হিসাবে না দেখে কর্তব্য হিসাবেই দেখা হয়েছে। দণ্ডনীতির ধারক ও বাহক হিসাবেই রাজার সৃষ্টি।

মহাভারতের শান্তিপর্বে শরশয্যায় শায়িত পিতামহ ভীষ্ম এবং যুধীষ্ঠিরের মধ্যে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে রাজনৈতিক চিন্তাকে প্রকাশ করা হয়েছে। এই রাজনৈতিক চিন্তা দণ্ডনীতিশাস্ত্র নামে খ্যাত। সাধারণভাবে দণ্ড

শব্দটি শাস্তি প্রদান অর্থে ব্যবহার হয়ে থাকে কিন্তু দণ্ডনীতি শব্দটির অন্তর্গত দণ্ড শব্দটির অর্থ অনেকটা প্রসারিত। দণ্ড শব্দটির ব্যাপক অর্থ হল যার দ্বারা সমগ্র জগত, সমাজ বিধিত হয়েছে। তাই দণ্ডনীতির ক্ষেত্রে উল্লিখিত দণ্ড শব্দটি শুধুমাত্র শাস্তি প্রদানকেই বোঝায় না, বরং যার দ্বারা সমাজের কল্যাণকর পরিস্থিতি নির্ধারণ করা সম্ভব, সেই অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। দণ্ড যখন লোক রক্ষার কাজে যুক্ত হয়, দণ্ড যখন জগতকে ধারণ করে তখন দণ্ডের মধ্যে নিগ্রহ এবং অনুগ্রহ- দুটি বৃত্তিই কাজ করে। সাধারণ মানুষকে দণ্ড যেমন একটা লক্ষ্যের দিকে টেনে নিয়ে যায় তেমনি দণ্ডকেও টেনে নিয়ে যেতে হয় কল্যাণময় এক লক্ষ্যের দিকে। এই পরস্পর পরিপূরক ক্রিয়ার মধ্যেই দণ্ডের ধারণ করার ক্ষমতা লুকিয়ে থাকে।

এবার আসি নীতি শব্দটিতে, নীতি শব্দটি এসেছে নী ধাতু থেকে- যার অর্থ নিয়ে যাওয়া। আরও পরিস্কার করে বললে বলা যায় টেনে নিয়ে যাওয়া। যিনি নেতৃত্ব দিয়ে অন্য মানুষদের একটি লক্ষ্যের দিকে টেনে নিয়ে যান, তিনি নেতা। এই নেতা শব্দটিও এসেছে নী ধাতু থেকে।

রাজার দোষ:

১। রাজার অত্যাধিক নরম হওয়া দোষের এবং দণ্ড প্রয়োগের ক্ষেত্রেও অতি নরম হওয়া দোষের। রাজাকে হতে হবে বসন্তকালীন সূর্যের ন্যায় অনতি মৃদু ও অনতি তেজস্বী।

২। রাজা রাজকর্ম পরিচালনার ক্ষেত্রে সঠিকভাবে ইন্দ্রিয় পরায়ণ না হওয়া দোষের। রাজাকে হতে হবে ইন্দ্রিয় পরায়ণ অর্থাৎ সমস্ত দিকে নজর রাখতে হবে।

৩। রাজার কোন প্রকার ভুল ধারনার প্রতি বশবর্তী হওয়া দোষের। ভুল ধারণার সমাধান করে এগিয়ে যেতে হবে।

৪। রাজকর্ম পরিচালনার ক্ষেত্রে রাজার ক্রোধের বশবর্তী হওয়া দোষের। ক্রোধ সমস্ত কিছুকে ধ্বংস করে।

৫। বেদ বা বৈদিক ধর্মের প্রতি রাজার বিশ্বাস না থাকা দোষের। বৈদিক ধর্মের প্রতি অনীহা থাকা দোষের।

৬। রাজার বিজ্ঞ পুরুষের সঙ্গে অ-পরিচয় অর্থাৎ বিজ্ঞ পুরুষের সঙ্গে রাজার পরিচয় না থাকা দোষের।

৭। রাজকর্মে বা কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে রাজার আলস্যতা থাকা দোষের।

৮। রাজার একাকী কোনো নীতি নির্ধারণ করা দোষের। অর্থাৎ কোনো মন্ত্রী বা অমলাতন্ত্রদের সাহায্য ছাড়াই একাকী কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ দোষের।

৯। মাঙ্গলিক কর্মের অনুষ্ঠান না করা দোষের। অর্থাৎ রাষ্ট্রে যজ্ঞাদি, শুভকাজ না করা হল রাজার দোষ।

১০। যুগপদ একই সঙ্গে দুজন শত্রু রাজার সঙ্গে বিরোধ থাকা দোষের।

১১। রাজার মিথ্যাভাষণের দ্বারা রাজকর্ম পরিচালনা করা দোষের।

১২। রাজার অনভিজ্ঞ লোকের সাথে থেকে মতামত গ্রহণের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা দোষের।

১৩। রাজার মন্ত্রী বা অমাত্যদের সাথে আলাপ-আলোচনা না করে কোনো মন্ত্রণার বশবর্তী হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা দোষের।

১৪। রাজকর্ম পরিচালনার ক্ষেত্রে গোপনীয়তা বজায় না রাখা দোষের।

উপরিউক্ত এই দোষগুলি রাজা বর্জন না করলে সুষ্ঠুভাবে রাজকার্য পরিচালনা করা সম্ভব নয়।

মিলিন্দপনহ্ গ্রন্থে রাজা মিলিন্দ ও ভিক্ষু নাগসেনের মধ্যে যে কথোপকথন হয়েছিল সেখানে রাজা মিলিন্দের যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে তা হল—

১। রাজা তার রাষ্ট্রে জনকল্যাণমূলক নীতি প্রণয়ন করে সঠিকভাবে রাজকার্য পরিচালনা করবেন।

২। একজন রাজা সাধারণ মানুষের সুখে যেমন উল্লসিত হবেন, তেমনি দুঃখেও কাতর হবেন।

৩। পূর্বতন ন্যায়পরায়ন রাজারা সেইসময় যেভাবে নীতি প্রণয়ন করেছিলেন, ঠিক তেমনি বর্তমান রাজাও সেইসমস্ত নীতিগুলিকে যথাযথভাবে প্রণয়ন করবেন এবং ভবিষ্যতেও সেই নিয়ম-নীতি বহন করার বার্তা রেখে যাবেন।

নাগার্জুন তাঁর 'রত্নাবলী'-তে[3] রাজাকে একটি সমৃদ্ধ গাছের সঙ্গে তুলনা করেছেন। গাছের ফুলগুলি যেমন অন্যকে তার সুবাস ও সৌন্দর্য প্রদর্শনের জন্য প্রস্ফুটিত হয়, ঠিক তেমনি রাজাও অন্যের বা সমাজের সুখের জন্য রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন এবং গাছ যেমন ছায়া দিয়ে মানুষকে সূর্যের প্রখর রোদের হাত থেকে রক্ষা করে, ঠিক তেমনি রাজাও তাঁর দয়া, সহিষ্ণুতা ও তিতিক্ষা দ্বারা বিপথগামী মানুষকে সুপথে পরিচালিত করেন। এই বর্ণণার মধ্য দিয়ে রাজার নৈতিক উৎকর্ষতার গুরুত্ব প্রকাশ পেয়েছে।

রাজা হঠাৎ করে কোন সিদ্ধান্ত নেন না যাতে সাধারণ মানুষের কোন ক্ষতি হয়। এধরণের ভুল থেকে নিস্কৃতি পাওয়ার জন্য রাজা ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করবেন এবং অন্যদেরও উৎসাহ দেবেন। রাজা কোন ব্যক্তিগত যশ, খ্যাতি বা প্রতিপত্তির জন্য রাজ্য শাসন করেন না, আবার অনন্দলাভের জন্যও করেন না, তিনি নীতি প্রণয়ন করে রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য রাজ্য শাসন করেন।

রাজার কর্তব্য:

শান্তিপর্বে ৫৭ নং অধ্যায়ে[4] রাজার কর্তব্য প্রসঙ্গে বলা হয়েছে রাজার পক্ষে উদ্যোগী হওয়া অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যাক্তি রাজা, অমাত্য, সুহৃৎ, কোষ, দেশ, দুর্গ ও সৈন্য রাজ্যের এই সাতটি অঙ্গের বিরুদ্ধাচারণ করবে সেই ব্যাক্তি গুরুই হোন বা মিত্রই হন, অবশ্যই রাজার শাস্তি দেওয়া অবশ্য কর্তব্য।[5] বৌদ্ধশাস্ত্রেও আমরা দেখতে পাই যে, শাস্তি বিধানের ক্ষেত্রে কোন বৈষম্য ছিল না, অপরাধী সে যে বর্ণের বা ধর্মের হোক না কেন সে যোগ্য শাস্তি ভোগ করবে। তবে শাস্তিবিধান হিসাবে প্রাণদণ্ড সমর্থন হয় নি।

শান্তিপর্বে ৫৮ নং অধ্যায়ে[6] বলা হয়েছে গুপ্তচর ও অন্যান্য রাজকর্মচারীদের বিরক্ত না করে যথাক্রমে বেতন দান, অসৎ পথ অনুসরণ না করে যুক্তি অনুসারে প্রজাদের করগ্রহণ, প্রজাদের হিতসাধন, জীবন ও গৃহকে সুরক্ষিত করা প্রভৃতি কাজগুলি রাজা যত্নসহকারে করবেন। অন্যান্য জনকল্যাণকর কর্মসূচীর কথা বলা হয়েছে, যেমন, অনাথদের প্রতিপালন, বৃদ্ধদের শুশ্রুসা, দরিদ্র ও বিধবাদের জীবিকার ব্যবস্থা করা, সৎপাত্রে ধনদান, অসৎ লোকের কাছ থেকে ধন সংগ্রহ করে সৎ লোকেদের মধ্যে বিতরণ প্রভৃতি কাজগুলি রাজার কর্তব্য।

এখন প্রশ্ন হল প্রজারা রাজাকে মান্য করবে কেন? এই প্রসঙ্গে শান্তিপর্বে শরশয্যায় শায়িত পিতামহ ভীষ্ম বলেছেন, রাজাই প্রজাদের অরাজক অবস্থা থেকে মুক্ত করে প্রজাদের ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ সাধনের সহায়ক হন। এ কারণেই প্রজাদের প্রথম কর্তব্য হল রাজা হিসাবে একজনকে প্রতিষ্ঠিত করা। কারণ, অরাজক রাজ্যে বাস করার চেয়ে বেশী ক্ষতিকর আর কিছুই নেই।[7] আবার, রাজাকে মেনে চলার কারণ হিসাবে রাজার প্রতি দেবত্ব আরোপ করা হয়েছে। বলা হয়েছে রাজা মানুষরূপী দেবতা, সুতরাং রাজাকে মানুষ হিসাবে দেখা বা অবজ্ঞা করা উচিত নয়। রাজা হল প্রজাদের প্রধান শরীর, আবার প্রজারাও রাজার অতুলনীয় শরীর। রাজা ছাড়া যেমন রাজ্য হতে পারে না, সেরূপ রাজ্য ছাড়া রাজা হতে পারে না।

বৌদ্ধশাস্ত্রে আমরা দেখতে পাই যে, রাজার প্রজাবৎসল মানসিকতা, বিচক্ষণতা, কর্তব্যপরায়ণতা, সমদর্শী মনোভাব, জনকল্যাণমুখী কার্যকলাপ ও অপার মমত্ববোধ তাঁকে সত্য ও ন্যায়পরয়ণতার প্রতিমূর্তি করে তোলে। সেই কারণে প্রজারা রাজাকে মান্য করে।

প্রজা বিদ্রোহ:

মহাভারতের শান্তিপর্বে দুধরণের বিদ্রোহের কথা উল্লেখ আছে। আভ্যন্তরীণ এবং বহিরাগত।

আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ আবার তিন ধরণের, 'রাজার নিকট আত্মীয় বা জ্ঞাতি গোষ্ঠী কর্তৃক বিদ্রোহ', 'অমাত্যগণ কর্তৃক বিদ্রোহ', 'প্রজা বিদ্রোহ'।

১। যদি রাজার নিকট আত্মীয় বা জ্ঞাতি গোষ্ঠী দ্বারা বিদ্রোহ দেখা যায় তাহলে রাজা ক্ষমা, সরলতা, মৃদুতা, যথাশক্তি অনুদান ও উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করে সেই বিদ্রোহ দমন করবেন।

২। যদি অমাত্যগণ বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন তাহলে প্রথমেই অমাত্যগণকে দোষী সাব্যস্ত না করে রাজার উচিত ধীরে ধীরে অমাত্যগণের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া, তারপর অমাত্যদের সকলের দোষ একে একে প্রমাণ করে প্রত্যেককে বিনাশ করা উচিত। সকলের প্রতি একসঙ্গে দোষারোপ করলে সকল অমাত্য মিলিত হয়ে রাজশক্তিকে দুর্বল করতে পারে। অমাত্যদের মধ্যে বিরোধ ঘটিয়ে মন্ত্রীদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা উৎপাদন করে হীনবল করা এবং একজন দোষী অমাত্য দিয়ে অপর দোষী অমাত্যকে বিনষ্ট করা উচিত।

৩। যদি প্রজারা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে তাহলে ব্রাহ্মণগণই রাজার প্রধান অবলম্বন হবে। অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের সাহায্য নিয়ে রাজা সে বিদ্রোহ দমন করবেন। কিন্তু বিদ্রোহ দমন করার পর বিদ্রোহী প্রজাদের সঙ্গে রাজা ভাল ব্যবহার করবেন ও মঙ্গল করবেন। এর ফলে বিদ্রোহী প্রজাগণ ক্রমশ ধর্মসম্মত নিজ নিজ কাজে যুক্ত হবেন।

বাইরের শত্রু দ্বারা আক্রমন হলে রাজা সমস্ত বর্ণের মানুষেরই সাহায্য নেবেন। এক্ষেত্রে শুদ্র বর্ণের অস্ত্রধারণ দোষী বলে বিবেচিত হবে না।

কূটনীতি:

মহাভারতের মূল কাহিনীটি যুদ্ধনির্ভর হলেও কিংবা আরো অনেক যুদ্ধের উল্লেখ থাকলেও মহাভারতীয় রাজনীতিতে তথা প্রাচীন রাজনীতিজ্ঞদের কাছে যুদ্ধ ছিল একান্ত বর্জনীয়। যুদ্ধের চেয়ে কূটনীতিকেই প্রাধান্য দেওয়া হতো বেশি। তখনকার শাস্ত্রকাররা দুই রাষ্ট্রের বিরোধ মিটানোর জন্য মূলত চারটি অঙ্গকে নির্ধারণ করেছিলেন- সাম, দান, ভেদ এবং দণ্ড। সাম মানে মধুর বাক্যে আলোচনার মাধ্যমে শত্রুর সঙ্গে শান্তিভাবে বিবাদ মিটানো। সামে কাজ না হলে দান, অর্থাৎ খানিকটা ছাড় দেওয়া। এর প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই মহাভারতের অন্য এক পর্বে, দ্রৌপদীকে বিয়ে করার পরে যখন পাণ্ডবরা হস্তিনাপুরে ফিরে এলো তখন ধৃতরাষ্ট্র তাদেরকে অর্ধেক রাজ্য ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হল। কারণ, বার্ণাবর্তে পুড়িয়ে মারার দায় থেকে মুক্তি পেতে, এখানে যুধিষ্ঠির বড়ো ভাই না হয়ে যদি ভীম বা অর্জুন বড়ো ভাই হতো তাহলে যুদ্ধ তখনই শুরু হয়ে যেতো। যাইহোক, দানে কাজ না হলে শত্রু রাষ্ট্রে ভেদ তৈরি করতে হবে—রাজার সঙ্গে মন্ত্রীর, সেনাপতির সঙ্গে রাজার, মন্ত্রীর সঙ্গে মন্ত্রীর, প্রজাদের মধ্যে রাজার সম্বন্ধে মিথ্যে গুজব ছড়ানো, ইত্যাদি। এই তিনটের কোনটিই কাজ না হলে দণ্ড অর্থাৎ আক্রমণ—সাম-দান-ভেদের প্রক্রিয়া চলাকালীন সময়ের মধ্যেই শত্রু রাজ্যে আক্রমণ করা। ভীষ্ম তাঁর উপদেশে যুধিষ্ঠিরকে এ ব্যাপারে বলেন, "যদি সাম ও দানের মাধ্যমে শত্রুকে জয় করতে পারা যায়, সেই জয়ই হলো শ্রেষ্ঠ জয়। ভেদ নীতিতে যে জয় আসে, সেটা মধ্যম মানের জয়। আর যুদ্ধের মাধ্যমে যে বিজয় লাভ ঘটে, তার চেয়ে জঘন্য কিছু নেই। মহাভারতে আমরা সাম ও দানের প্রয়োগ অহরহই দেখতে পাই।

এ প্রসঙ্গে বলাবাহুল্য যে, সম্রাট অশোকের কলিঙ্গ বিজয়ের অব্যবহিত পরেই শুভ বুদ্ধি জাগ্রত হয়, যুদ্ধের ভীষণ হত্যাকাণ্ড তাঁর মনে অনুশোচনার উদ্রেক করে এবং তিনি মর্মাহত হন। মহাভারতের প্রসঙ্গ টেনে বলা যায়, যুদ্ধের মাধ্যমে যে বিজয় লাভ ঘটল তা জঘন্য ছাড়া কিছু নই সম্রাট অশোক তা উপলব্ধি করেছিলেন। তাই তিনি কতগুলি অনুশাসন চালু করেন। অনুশাসনগুলি ঠিক এ রকম—জীব হত্যা নিবারণ। মনুষ্য ও পশুদিগের হিতার্থে বা মঙ্গলার্থে ঔষধালয় স্থাপন, কূপ খনন, বৃক্ষাদি রোপন ইত্যাদি। পিতৃ-

মাতৃভক্তি, ব্রাহ্মণ-শ্রমণে দান ইত্যাদি। কর্তব্যপালন, যুদ্ধ অভিনয়ের পরিবর্তে ধর্মসম্বন্ধীয় শোভাযাত্রা, প্রত্যেকের প্রতি সদ্ব্যবহার ইত্যাদি। দানশীলতা সকলের পক্ষে দুঃসাধ্য হলেও ইন্দ্রিয়সংযম, কৃতজ্ঞতা, চিত্তশুদ্ধি, কর্তব্যনিষ্ঠা এই সকল অত্যাবশ্যক ধর্ম সকলেরই পালনীয়। স্বধর্মের স্তুতিবাদ ও পরধর্মের অকারণ নিন্দাবাদ বর্জনীয়। সকল ধর্মের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা ইত্যাদি ইত্যাদি।

মহাভারতে কুটকৌশল প্রয়োগে সবচেয়ে এগিয়ে আছেন কৃষ্ণ। কী রাজনীতিতে, কী যুদ্ধের মাঠে সবখানেই তিনি এদিক দিয়ে এগিয়ে। অপরকে মন্ত্রণা দিয়ে কী করে নিজের কাজ আদায় করে নিতে হয়, তার অন্যতম উদাহরণ ভীম কর্তৃক কৃষ্ণের শত্রু মগধের রাজা জরাসন্ধকে হত্যা। জরাসন্ধ শত্রু এই কারনে যে, কংসের স্ত্রীদের মধ্যে দু'জন ছিলেন জরাসন্ধের কন্যা। কৃষ্ণ কংসকে বধ করার পরে জরাসন্ধের দুই মেয়ে তাদের বাবার কাছে গিয়ে তাদের স্বামী হত্যার প্রতিশোধ চান। তখন জরাসন্ধ বারবার করে আঠারবার মথুরা আক্রমণ করেন এবং কৃষ্ণকে মথুরা ছাড়া করেন। তাই তিনি কুটকৌশলে ভীমের হাতে জরাসন্ধের হত্যা করান।

দুর্যোধনের মন্ত্রণায় যুধিষ্ঠিরকে পাশা খেলায় ডেকে ধুরন্দর শকুনীর মাধ্যমে কৌশলে পাণ্ডবদের রাজ্য, অর্থ এমনকি স্ত্রী পর্যন্ত জয় করার বিষয়টি তো সর্বজনবিদিত।

বর্তমান যুগের মতো মহাভারতীয় রাজনীতিতেও প্রতিপক্ষ বা শত্রু দমনে কুটকৌশলের প্রয়োগ দেখা যায় বিস্তর। ন্যায়-অন্যায় বিবেচনাবোধের বাইরে গিয়ে শত্রুকে বিনাশ বা তাকে যুদ্ধে হারানোর জন্য কৌশলের আশ্রয় নিতে দেখা যায় প্রায় সব রাজাকেই।

মহাভারতের যুগে যে কেবল রাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাই প্রচলিত ছিলো তা নয়, অনেক অঞ্চলে সংঘরাষ্ট্র নামক এমন একটি শাসনব্যবস্থা প্রচলিত ছিল যেটিকে অনেকটা প্রজাতন্ত্র বা রিপাবলিকও বলা যেতে পারে। মহাভারতের অন্যতম প্রধান চরিত্র কৃষ্ণ এমনই একটি সংঘরাষ্ট্রের প্রধান ছিলেন। যেহেতু এই প্রধান পদের জন্য আলাদা কোন শব্দ ছিলো না বা এখনও নেই, তাই সংঘপ্রধানের পদটিকেও রাজা বলা হতো। সংঘরাষ্ট্রগুলোর বৈশিষ্ট্য হলো, এখানে রাজা এককভাবে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন না, তাঁকে সংঘের সিদ্ধান্তই মেনে নিতে হতো এবং কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে সমস্যা হলে সংঘ প্রতিনিধিদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে তা সমাধান করা হতো, যা অনেকটাই গণতান্ত্রিক।

রাজতন্ত্র শব্দটা আমাদের কল্পনা-জগতে একজন একনায়কতান্ত্রিক স্বৈরাচারী রাজার চিত্রই আঁকে। কিন্তু মহাভারতীয় রাজতন্ত্রে খুব কম সিদ্ধান্তই রাজাকে এককভাবে নিতে দেখা যায়। যে কোন সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রেই তাঁরা মন্ত্রী বা পরামর্শকদের ওপরে নির্ভর করতেন। ধৃতরাষ্ট্রের মন্ত্রীসভায় প্রবীণ বিদুর ও ভীষ্ম ছাড়াও ছিলেন দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য, কর্ণ, সঞ্জয়, ইত্যাদি।

রাজাদের সিদ্ধান্তগ্রহণ বিষয়ে নারদ যুধিষ্ঠিরকে যে প্রশ্ন করেছিলেন- "আপনি কোন সিদ্ধান্ত একাই নেন না তো বা অনেক লোকের সঙ্গে আলোচনায় বসেন না তো?" নারদের এই প্রশ্নটির মাধ্যমে রাজার সিদ্ধান্তগ্রহণে তখনকার রাজাদের শাস্ত্রীয় নিয়ম বোঝা যায়। তবে একালের গণতান্ত্রিক স্বৈরশাসকরা যেমন সংবিধানের ধার ধারেন না, তখনকার রাজতন্ত্রের রাজারাও শাস্ত্রের ধার ধারতেন না। মহাভারতে এ বিষয়ে ব্যতিক্রম ছিলো সংঘরাষ্ট্রগুলো। তবে সেখানেও যে দু-একজন স্বৈরশাসকে পরিণত হয়ে যেতেন না তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তার উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হল রাজা কংস।

উপসংহার:

সবশেষে বলি যে, সমাজের অস্তিত্বের জন্যই রাষ্ট্রের প্রয়োজন। নৈরাজ্য থেকে মুক্তির জন্যই রাজার প্রয়োজন। মহাভারতের রাষ্ট্রতত্ত্ববিষয়ক বক্তব্যসমুহ সর্বযুগের ক্ষেত্রেই প্রাসঙ্গিক। মহাভারতের শান্তিপর্ব ও অনুসাশনপর্ব প্রাচীন ভারতীয় রাজশাস্ত্র প্রসঙ্গে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, যেখানে রাজনীতি শাস্ত্রের সৃষ্টি,

রাজতন্ত্রের উদ্ভব ও প্রয়োজনীয়তা, রাজকর্তব্য, চরনিয়োগ, সপ্তাঙ্গ তত্ত্ব, দণ্ডনীতি, রাজমন্ত্রী নিরূপণ, পুর বা দুর্গ, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি, করনীতি, সমরনীতি প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হয়েছে। এই গুলি সবই রাজ্য পরিচালনার নীতি অর্থাৎ রাজনীতি।

বৌদ্ধশাস্ত্রে আমরা যে রাজার পরিচয় পাই, তিনি আসলে সত্য ও ন্যায়পরায়ণতার আদর্শ প্রতিমূর্তি। ধর্ম ও ন্যায়বোধ ছিল তার সকল কাজ কর্মের মূল চালিকাশক্তি। সেখানে লাভ-অলাভ ও মোহের প্রশ্ন অবান্তর। বৌদ্ধশাস্ত্রে যে রাজার পরিচয় পাই, তিনি জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হয়ে একদিকে যেমন ব্যক্তির সম্পদকে রক্ষা করতেন, তেমনি সমষ্টির সম্পত্তিকে রক্ষা করতেন।

তাই বলা যায়, উন্নত সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তি হল ন্যায়নীতি। রাষ্ট্র কর্তৃক প্রণীত আইনগুলোর বৈধতা নীতিশাস্ত্রের মাপকাঠীতে বিচার করা হয়। নৈতিক মানদণ্ডকে উপেক্ষা করে কোন রাষ্ট্রই নাগরিকের কল্যাণ সাধন করতে পারে না।

তথ্যসূত্র:

[1] দীঘনিকায়-III, PP 84-95
[2] বসু, রাজশেখর, মহাভারত, পৃ: ৫৬২
[3] রত্নাবলী-IV, p. 27
[4] ভট্টাচার্য, হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ, মহাভারতম্, পৃ: ১০৪৭
[5] দাস, কাশীরাম, মহাভারত, শান্তিপর্ব, পৃ: ২৪
[6] ভট্টাচার্য, হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ, মহাভারতম্, পৃ: ৬৪৪
[7] ভট্টাচার্য, হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ, মহাভারতম্, পৃ: ৬৩১

গ্রন্থপঞ্জী:

- গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল, (২০১৪), আমাদের মহাভারত, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।
- চক্রবর্তী, বিষ্ণুপদ, (১৯৯২), মহাভারত, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।
- চৌধুরী, সাধনকমল, (১৪১৫), বিশুদ্ধ মজ্ঝিমনিকায়, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা।
- চৌধুরী, সুকোমল, (২০১৩), সংযুক্ত নিকায় (তৃতীয় খণ্ড), মহাবোধি বুক এজেন্সী, কলকাতা।
- বসু, রাজশেখর (সারানুবাদিত), (১৪২০), কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস কৃত মহাভারত, এম সিভাদুড়ী, নৃসিংহপ্রসাদ, মহাভারতের অষ্টাদশী, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।
- ব্রহ্মচারী, শীলানন্দ, (২০১০), সংযুক্ত নিকায় (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড), মহাবোধি বুক এজেন্সী, কলকাতা।
- ভাদুড়ী, নৃসিংহপ্রসাদ, (২০০৩), মহাভারতের ভারতযুদ্ধ এবং কৃষ্ণ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।
- ভাদুড়ী, নৃসিংহপ্রসাদ, মহাভারতের অষ্টাদশী, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।
- ভিক্ষু, শীলভদ্র, (১৪০৪), দীঘনিকায়, মহাবোধি বুক এজেন্সী, কলকাতা।
- সিদ্ধান্তবাগীশ, হরিদাস (সম্পাদনা ও অনুবাদ), (১৪০০), মহাভারত খণ্ড ৩৫-৩৭, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা।